নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধ এবং পিতৃতন্ত্র বিলোপের সংগ্রাম

আজিজুর রহমান আসাদ

এক. উপলব্ধির প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধানের উপায়

নারী ও শিশুর প্রতি বিকৃতকামী সহিংসতা ও হত্যার ঘটনাসমূহ একধারে 'ব্যক্তিগত' ও অন্যধারে 'শারীরিক' সমস্যা হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে। প্রথমত, নারীর প্রতি সহিংসতার জন্য নারীর পোশাককে দায়ী করা হচ্ছে। যে নিপীড়িত তাকেই দোষী সাব্যস্ত করার একটি নারীবিদ্বেষী চিন্তার প্রাধান্য বাংলাদেশের ধর্মান্ধ মৌলবাদ প্রভাবিত সংস্কৃতিতে রয়েছে। ফলে, সমাজবিজ্ঞানের আলোয় নারীর প্রতি সহিংসতা উপলব্ধির প্রচেষ্টা দুর্বল ও অনেকের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কারণ এরা ইতোমধ্যেই জানে যে 'নারীর পোশাকই সহিংসতার জন্য দায়ী'।

যারা বিশ্বাস করে যে নারীর পোশাক হচ্ছে সমস্যা, তাদের কাছে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের উপায় হচ্ছে, নারীকে পর্দায় রাখা; বোরকা-হিজাবের অন্তরালে, পুরুষের দৃষ্টির বাইরে। এদের জ্ঞানের উৎস প্রধানত ধর্মাশ্রয়ী প্রচারণা। অন্যতম সূত্র ওয়াজ মাহফিলের বয়ান, যা সামাজিক মাধ্যমেও চলে এসেছে। এরা নারীর প্রতি সহিংসতার জন্য নারীকেই দায়ী করে।

দ্বিতীয় মতামত, যা নারীর প্রতি সহিংসতার সমস্যাকে দেখে 'আইনি' সমস্যা হিসেবে। এদের অভিমত হলো সুষ্ঠু বিচার নেই, বিচারে দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে, বিচার কেনা যায়, ফলে বিচারহীনতার সংস্কৃতি নারীর প্রতি সহিংসতার অপরাধকে উৎসাহিত করে। এরা সমস্যার সমাধান নিয়ে ভাবছে এই পূর্বানুমান থেকে যে, শাস্তির 'ভয়' অপরাধ করতে বাধা দেবে। উপলব্ধির প্রচেষ্টা নেই যে, কেন একজন সহিংসতার চিন্তা করে ও তা বাস্তবায়ন করে। অপরাধীর অপরাধ চিন্তার উৎস কী?

আইনের শাসন নেই, সুশাসন নেই। ঠিকই তো। কিন্তু আইন দিয়ে, বিচার দিয়ে, শাস্তি দিয়ে কি অপরাধী তৈরির ব্যবস্থা বন্ধ করা যায়? মাদারিপুরের সাজ্জাদ নামের লোকটি ১৮ বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসে ১৫ বছরের মেয়েটিকে বিকৃতকামী নির্যাতন ও হত্যা করে। জেলখাটার শাস্তির অভিজ্ঞতা এই লোকটিকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। সমাজ অপরাধী জন্ম দেয়, রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে তার শাস্তি দেয়। সমাজে অপরাধী জন্ম হতে না দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব পারিবারিক সামাজিকায়ন ও বিজ্ঞানচেতনার শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে।

অনেকে মনে করেন, পশ্চিমা আইনে হবে না, ইসলামি আইন, মানে শরিয়া আইন হলে কোনো অপরাধ থাকবে না। এরকমটা বাংলাদেশের অনেক 'শিক্ষিত' লোকও মনে করেন, সাহসের সাথে তা প্রকাশও করেন। গত তিন বছরে ইসলামি শরিয়া আইনের দেশ থেকে প্রায় ৩০০ নারীর লাশ এসেছে বাংলাদেশে। বলা হয় 'আত্মহত্যা' বা 'হার্ট অ্যাটাক'। বাঙালি নারীর প্রতি আরবীয় পুরুষের বিকৃতকামী সহিংসতা ইসলামি আইন দিয়ে বন্ধ করা যায় নি, খোদ নবীর দেশে। বাংলাদেশে সম্প্রতি নারী ও শিশুর প্রতি বিকৃতকামী সহিংসতার ঘটনা ঘটছে মাদ্রাসায়। এইসব আলেম-ওলামা-মাদ্রাসাশিক্ষকদের কি পারলৌকিক শাস্তির 'ভয়' নেই?

বিকৃতকামী অপরাধকে কেবল 'আইনি' বা সুশাসনের সংকট হিসেবে দেখা একটি খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিপীড়িতকে দায়ী করছে না বটে, কিন্তু অপরাধের মূল ও বহুমুখী কারণ আড়াল করছে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার সমস্যাটিকে সামগ্রিকতায় বোঝার জন্য একটি প্যারাবল বা গল্প দিয়ে শুরু করি।

এক লোক খালের পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সে দেখল যে একটি শিশু খালের জলে হাবুডুব খাচ্ছে। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে শিশুটিকে উদ্ধার করল। পাড়ে ওঠার সাথে সাথেই সে দেখল আরেকটি শিশু পানিতে। সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্বিতীয় শিশুটিকে বাঁচাল। ঘুরে দাঁড়াতেই সে দেখল আরেকটি শিশু। সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তৃতীয় শিশুটিকেও তুলে আনল। সে এবার নিজের পথে যাবে। কিন্তু এ কী! দেখা যাচ্ছে আরেকটি শিশু। সে ক্লান্ত এবং প্রথমবারের মতো দেখার চেষ্টা করল, কেন এই শিশুরা জলে পড়ছে।

এবার সে দেখল, ঝোপের পেছনে একটি দানব, যে আরো অনেক শিশুকে জলে ছুড়ে দিয়ে হত্যা করতে চাইছে। সে দ্বিধায় পড়ে গেল। সে কি জলে হাবুডুবু খাওয়া শিশুটিকে বাঁচাবে, নাকি দানব বধ করবে, যাতে ভবিষ্যতে কোনো শিশুকেই আর জীবন দিতে না হয়?

নারী ও শিশুর প্রতি বিকৃতকামী অপরাধ যে করছে, সে কেন করছে? কী তার স্বার্থ? কী তার প্রয়োজন? এটা বুঝতে হলে প্রথমে বিকৃতকামী অপরাধীর মগজের দিকে তাকাতে হবে, নারী বা শিশুর পোশাকের বদলে। কিংবা শাস্তির 'ভয়' নামক মানসিক বাধার বদলে, তাকাতে হবে অপরাধীর সেইসব ভাবনার দিকে, যা তাকে অপরাধে প্ররোচিত করে।

দুই. মগজের দিকে তাকান, নিউরনে ধর্ষকামিতা

নারীর প্রতি সহিংসতা যে করে, তার অপরাধ বোঝার জন্য, প্রথমে প্রশ্ন করা দরকার– 'কেন সে সহিংসতা করে', 'কী তাকে প্ররোচিত করে', 'কী ধরনের ভাবনা থেকে সে এই সিদ্ধান্ত নেয়'। এজন্যই তার মগজের দিকে তাকাতে হবে।

ধর্ষকের মগজের দিকে তাকানোটা মনোবিজ্ঞানের কাজ। মনোবিজ্ঞান দিয়েই ধর্ষকের আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু মনোবিজ্ঞান, ধর্ষকের ক্ষমতার উৎসের সন্ধান দেয় না। ধর্ষক যে সমাজে বাস করে, সেই সমাজের ক্ষমতাসম্পর্কের বাস্তবতা ব্যাখ্যা করে না। সেজন্য আমাদের সমাজবিজ্ঞানের কাছেও যেতে হয়। ক্ষমতাসম্পর্ক কীভাবে আছে, কেন আছে, সেই বিশ্লেষণ জানার জন্য সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামো ও পদ্ধতির ব্যবহার দরকার। মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সমন্বিত পদ্ধতি ব্যবহার করে নারীর প্রতি সহিংসতার সমস্যাটিকে আমরা সামগ্রিকতায় বুঝতে পারি। প্রথমে আমরা ব্যক্তির আচরণ দেখব, তারপর সমাজবিজ্ঞানের আলোয় বোঝার চেষ্টা করব, অপরাধীর সামাজিক প্রেক্ষাপট।

বিকৃতকামী অপরাধীর মগজে কী আছে? তার এক ধরনের মাইন্ডসেট আছে, ধারণা-চিন্তা-বিশ্বাস আছে। তার বিশ্বাস যে, নারীরা হেয়, হীন, দুর্বল, স্বল্পবুদ্ধি, চক্রান্তকারী, অঘটনঘটনপটীয়সী, অবোধ্য, অবাধ্য (মেছওয়াক বা পুষ্পশাখা দিয়ে পিটিয়ে সোজা রাখতে হয়), ইত্যাদি। নারী বিপজ্জনক, ভয়ঙ্কর ও আগুনের মতো, যা মোমকে (পুরুষ মোমের পুতুল) গলিয়ে দেয়। পুরুষকে ফুসলিয়ে অপরাধ করায়

(যেমন শয়তানের প্ররোচনায় আদমকে গন্দম ফল খাইয়ে স্বর্গ পতন, নয়নকে দিয়ে রিফাতকে হত্যা, ইত্যাদি)। অন্যধারে নারীরা আবার তেঁতুল, ছিলা কলা, হরিণের মতো খাদ্যবস্তু, ভোগ্যবস্তু, যৌনবস্তু।

কোনো পুরুষ (বা নারীও) যখন এই ধরনের ধারণা ও শিক্ষা পায়, ওয়াজ নসিহতে, সিনেমায়, পারিবারিক সামাজিকায়নে, তখন তার মগজে বা নিউরনে এই ধারণার একটি স্থায়ী ছাপ পড়ে। পরে, যখন সে অপরাধের কোনো সংবাদ শোনে, তার মগজ নিজে নিজেই অপরাধের সাথে 'নারীর সংশ্লিষ্টতা' খুঁজতে থাকে; যেমন, সে 'শালীন পোশাক পরে নি'। অন্য কোনো কারণ আর তার মাথায় ঢুকতে পারে না। আসলে তার মগজের নিউরাল সিস্টেমই তাকে চালিত করে।

এই নিউরাল সিস্টেম ব্যপারটা একটু খোলাসা করা যাক। আমাদের মগজ আসলে একটা সিস্টেম, যা দীর্ঘ বিবর্তনে গড়ে উঠেছে, জেনেটিক ও সামাজিক প্রভাবে। স্নায়ুকোষের অন্তর্জাল (Nervous System) শরীরের বিভিন্ন অংশের কাছে সংকেত পাঠাতে পারে। মস্তিষ্কের এই স্নায়ুতন্ত্রের কোষের নাম নিউরন। যারা নিজেদের মধ্যে অভিনব পন্থায় যোগাযোগ করে, পরস্পরের সাথে। নিউরন মগজের মৌলিক একক বা কর্ম ইউনিট। এটি একটি বিশেষ ধরনের কোষ, যা অন্য স্নায়ুকোষ, পেশি ও গ্লান্ডকোষকে তথ্য বা সংকেত সম্প্রচার করে।

অধিকাংশ নিউরনে একটি কোষদেহ আছে, একটি এক্সন (axon) এবং ডেন্ড্রাইটস (Dendrites) আছে। এই এক্সন কোষদেহ থেকে বেরিয়ে আসে, অনেকটা শেকড়ের মতো; শেষ হয় স্নায়ুর বন্দরে (Nerve terminals)। ডেন্ড্রাইটস নিউরন কোষ থেকে বেরিয়ে এসে অন্য নিউরন কোষের বার্তা গ্রহণ করে। সাইন্যাপসেস (Synapses) হচ্ছে কন্টাক্ট পয়েন্ট, যেখানে একটি নিউরন আরেকটি নিউরনের সাথে যোগাযোগ করে।

এই যে সংকেত নেওয়া-দেওয়া, এই সংকেত বা ভাষা সামাজিক। যে সমাজে ওই ব্যক্তি জন্মায়, সেই সমাজের। নিউরন যখন শিখল বা নিজেদের মধ্যে অনেকদিন ধরে সংকেত বিনিময় করল যে, 'নারী ভোগ্যবস্তু', তখন নিউরন নিজে নিজেই নিউরন কাঠামো তৈরি করে। আবার সংকেত বিনিময়ের সাথে হরমোনের যোগ আছে। সেরোটোনিন (Serotonin) নামক একটি হরমোন আছে, যা নিঃসরণ হলে মানুষ খুশি থাকে। একদিকে 'নারী' শব্দ সেরোটোনিন হরমোন নিঃসরণ করে, সাথে সাথে নিউরন 'ভোগ্যবস্তু', 'অপরাধের মূলে'– এই ভাবনার সংকেত চালাচালি শুরু করে দেয়, ব্যক্তির অজান্তেই। ফলে নারীবিদ্বেষ 'সুখের' অনুভূতি দেয়।

এই নিউরন ও হরমোন নিজেদের পথ বা কাঠামো পুনর্গঠিত করতে পারে। মানে, আপনি শুনলেন যে, 'নারী ব্যক্তি', 'মায়ের জাত', কিন্তু আপনার নিউরন এই ভাবনা আদানপ্রদানের সংকেত নিতে আগ্রহী না। এটাকে বলে, মনস্তত্ত্বের ভাষায় ইমোশনাল ডিফেন্স (Emotional Defence)। কারণ তার নিউরনে এর বিপরীত চিন্তাই আকর্ষণীয়, যেটাকে বলে Emotional Attraction। সে নারীবিদ্বেষে আকর্ষণ বোধ করে, আবেগগতভাবে।

ধর্ষক তার বিকৃতকামী সহিংসতার মাধ্যমে নারীর প্রতি যে ঘৃণার প্রকাশ ঘটায়, সেটার বাস নিউরনে। এই ঘৃণা দীর্ঘলালিত, যা কখনো ভয় ও পুরুষের আত্মঅক্ষমতার বোধ থেকেও জন্ম নেয়। নারীর

ক্ষমতাকে ভয় ও ঘৃণা করার উপাখ্যান 'স্বর্গ থেকে পতনের' সেই আদি উপাখ্যান থেকেই, যা পিতৃতন্ত্রের জন্মকালে শুরু হয়েছে।

এই রূপকথা অনুসারে, ঈশ্বর প্রথম মানব মানবী আদম ও ইভকে স্বর্গেই রেখেছিলেন এবং সুখ শান্তির কোনো কমতি ছিল না। ঈশ্বর শুধু জ্ঞানবৃক্ষের ফল (গন্ধম) খেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় ইভ নিজে তো সেই ফল খেলই, আদমকেও বাধ্য করল ফল খেতে। ঈশ্বর এই অবাধ্যতার শাস্তি দিলেন স্বর্গ থেকে এই জলকাদা ও মরুভূমির দুঃখ কষ্টের পৃথিবীতে তাদের নির্বাসনে পাঠিয়ে।

পুরোটাই ইভের দোষে, কিন্তু আদমের অক্ষমতায়ও পুরুষরা আজ স্বর্গ থেকে পতিত। মানে নিরন্তর 'ভোগের' সুবিধার বাইরে কাজ করে খেতে হচ্ছে। ফলে, পুরুষের যা দুঃখ-দুর্দশা সবই নারীর কারণে। এই গল্পের অনেক নয়া ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তাতে পুরুষের আত্মঅক্ষমতার সত্য বদলে যায় নি, পরিণামে নারীর প্রতি ভয় ও ঘৃণার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যায় নি। ধর্ষকের এই দৃষ্টিভঙ্গি তাই ঐতিহাসিক, ধর্মের এই রূপকথা সৃষ্টির কাল থেকেই, যা শুরু হয়েছে দাস সমাজে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভবের কারণে।

আজকের বাংলাদেশের মতো প্রান্তিক পুঁজিবাদী সমাজেও 'পুরুষের স্বর্গ থেকে পতনের' কারণ নারী। শিক্ষায় মেয়েরা অনেক এগিয়ে থাকে, পরীক্ষায় ভালো ফল করে, 'নারী নেতৃত্ব হারাম' প্রচারণার পরেও মুসলমানেরা নারী নেতৃত্ব মেনে চলে, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকুরিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ছে, ডিভোর্সের হারও বাড়ছে এবং নারীদের সাথে প্রতিযোগিতায় পুরুষেরা পিছিয়ে যাচ্ছে, মেধায় ও কর্মক্ষেত্রে। তাই নারীকে ভয়ের কারণ এ যুগেও কমে নি, কমে নি ভয় ও ঘৃণা, প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যেতে হচ্ছে বলে।

বছরদশেক আগে, নারীর প্রতি সহিংসতা নিয়ে একটি গবেষণা করতে গিয়ে, উপজেলা পর্যায়ে পর্নোগ্রাফি ভিডিও ক্লিপ বিক্রি করে, এমন এক 'বখাটে' তরুণের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তার কোনো প্রেমের সম্পর্ক আছে কি না জানতে চাইলে সে বলে, 'মেয়েদের আমি ভয় পাই, আমি কখনো বিয়ে করব না'। ১৯ বছর বয়সী এই ছেলেটির ধারণা, 'মেয়েরা ভয়ঙ্কর', 'মেয়েরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই।' নারীর প্রতি ভয়, ঘৃণা, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধপরায়ণ মনোভঙ্গী যে পুরুষের, সে তো ধর্ষক হয়ে উঠবেই।

তিন. যৌনবস্তুর ধারণা, বিকৃতকামী বিকলন

একটি সমাজে সকল পুরুষের মননে এই ভয় ও হীনম্মন্যতাবোধ থাকলেও, সব পুরুষ কিন্তু ধর্ষকের আচরণ করে না। ধর্ষকের মনোজগৎ অন্যদের থেকে কিছুটা আলাদা। ধর্ষকের মনোজগতে অনেকগুলো ভাবনা-চিন্তার সমাবেশ ঘটে : ১. সে তার 'শিকার'কে নিয়ে সহিংস যৌনকল্পনা করে; ২. সে তার সহিংসতার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করায়, তার অপরাধের বৈধতা দেওয়ার জন্য; ৩. সে তার সহিংসতার পরিকল্পনা করে, বিবেচনা করে ঝুঁকির এবং সবকিছু বিচার করার পরই কেবল সে তার 'শিকার'কে আক্রমণ করে। চিন্তার এই সবকটি ধাপ পেরিয়েই সে ধর্ষক হয়ে ওঠে।

নারীর প্রতি যৌন সহিংসতা ঘটানোর জন্য, কিশোরদের যৌনশিক্ষা ও যৌন অভিজ্ঞতার একটি ভূমিকা রয়েছে। যৌন সহিংসতা, কেবল নারীর প্রতিই নয়, ছেলেশিশু ও 'মেয়েলি' পুরুষের ওপরও ঘটে থাকে।

ছেলে ও মেয়েশিশুর ওপর যৌন সহিংসতা নিয়ে ভারতের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ছেলেশিশুরা বেশি সংখ্যায় যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে মেয়েশিশুর তুলনায়; কারণ, অভিভাবকেরা মেয়েশিশুদের নিরাপত্তায় যতটা সচেতন, ছেলেশিশুদের প্রতি ততটা নন।

ধর্ষকের কাছে যৌন সহিংসতা হচ্ছে যৌনতৃষ্ণা নিবারণের জান্তব ফ্যান্টাসি। হরমোনের প্রাকৃতিক কারণে সে যৌনতৃষ্ণা অনুভব করে, কিন্তু হরমোন তাকে 'সহিংস যৌনকল্পনা'র কোনো সংকেত দেয় না, এই সহিংস কল্পনা-প্রত্যাশা তার সামাজিকায়নের ফল। এই শিক্ষা নিয়ে সে একটি স্ক্রিপ্ট বা নাটকের অভিনয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে, তার নিজের যৌন আচরণের জন্য। এটাকে যৌন আচরণের গবেষকেরা বলেন 'স্ক্রিপ্ট থিয়োরি'। এই সহিংস কল্পনা একটি বিকৃতি, মানসিক অসুস্থতা, ধর্ষকামিতা বা স্যাডিজম।

এই বিকৃতকামী চিন্তার শুরুটা বয়ঃসন্ধিকালেই। শারীরিক পরিবর্তন সম্পর্কে ছেলেদের অনেক প্রশ্ন থাকে। কীভাবে সে এই প্রশ্নসমূহের উত্তর পেয়ে থাকে তার ওপর নির্ভর করে সে সুস্থ নাকি অসুস্থ যৌনচেতনা নিয়ে বড়ো হবে। বিজ্ঞানের আলোয় প্রজননস্বাস্থ্য, রোমান্টিক ভালোবাসা (কবিতা, গল্পপাঠ ইত্যাদি থেকে) এবং নারী-পুরুষ সমতা সম্পর্কের মানবিক শিক্ষা পেলে সে সুস্থ যৌনচেতনা নিয়ে বিকশিত মানুষ হতে পারে। বিজ্ঞানচেতনার সাথে সমতা, সমানুভূতি ও যত্নশীলতার মূল্যবোধের সম্মিলন তাকে মানবিক পুরুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

বিপরীতে, সে যদি বিশ্বাস করে যৌনতা হচ্ছে সহিংস 'আনন্দ', ভালোবাসা বা প্রেম হচ্ছে 'ইচ্ছার বিজয়', 'জবর দখল' বা সম্পত্তি হিসেবে নারীকে 'পুরো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা'; নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য হচ্ছে 'প্রাকৃতিক বা ঈশ্বরপ্রদত্ত' ব্যাপার এবং নারীরা হচ্ছে 'অপশক্তি' যারা পুরুষের মনের ওপর 'কুপ্রভাব' ফেলতে পারে– অর্থাৎ নারী হচ্ছে, লোভনীয় বস্তু কিন্তু হেয়, হীন ও ভয়ঙ্কর, তাহলে এই অসম্পূর্ণ, বিকৃত ও নেতিবাচক ধারণা, বিকৃত যৌনচেতনা এবং ধর্ষকামিতার অসুস্থতা জন্ম নিতে পারে।

যে ধারণাগুলো তার যৌনচেতনার ভিত্তি, এই ধারণাগুলো সে কোথা থেকে পেল? প্রধান সূত্র ধর্মসংস্কৃতি তথা ধর্মাশ্রয়ী আলাপ আলোচনা, যা প্রধান সকল ধর্মেই গল্প আকারে রয়েছে এবং তার সঙ্গে নিজের কল্পনার মিশেল। এরপর চটি বই, সিনেমা, পত্রিকা, ইত্যাদি থেকে সে তার চিন্তাকে আরো গভীর ও শিলীভূত করে। তার চাহিদা ক্রমাগত বিকৃত সহিংস যৌনাচারের দিকে ধাবিত হয়। এই চাহিদার জোগান দেয় 'বিনোদন' ব্যবসা ও এক শ্রেণির ওয়াজকারী ধর্মব্যবসায়ীরা।

ধর্মসংস্কৃতি মানেই যে সবসময় এবং পুরোটাই একইরকম হবে, তা নাও হতে পারে। পারিবারিক ধর্মচেতনা সেক্যুলার হলে তারা সহিংসতার বদলে শান্তি ও সহনশীলতাকে গুরুত্ব দেবে, প্রজননস্বাস্থ্য শিক্ষা দেবে, সাহিত্যের রোমান্টিক ভালোবাসার পাঠ দেবে। সুফী হলে নারীকে উচ্চাসনেও বসাবে, নারীর শরীর মসজিদের চেয়েও পবিত্র শিক্ষা দেবে, মায়ের পায়ের নিচে বেহেস্তের ধারণার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেবে। কিন্তু মৌলবাদী হলে নারীকে হেয়, হীন, ভোগ্যবস্তু (ছিলা কলা, তেঁতুল), ভয়ঙ্কর ও পোশাকের আড়ালে নিয়ন্ত্রণে রাখার ফতোয়া দেবে।

ধর্ষকের যৌনচিন্তার অনুষঙ্গ নারীর শরীর, যে শরীর কেবলই ভোগ্যবস্তু ও ভোগ্যপণ্যের অবয়ব ও প্রতীক। এই শরীর সম্পর্কে 'জ্ঞান' তার ইসলামি জলসায় পর্দার আলাপে, ওয়াজ মাহফিলের বয়ানে এবং 'নিষিদ্ধ' বই ও সিনেমা থেকে আহরণ করা। এখানে বিজ্ঞানের আলো পড়ে না। নারীর হরমোন, প্রজননস্বাস্থ্য ও

মাতৃত্বের বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি সে জানে না। এখানে নন্দনতত্ত্বের প্রবেশ নেই, শরীরের নান্দনিক সৌন্দর্য আবিষ্কারে শিল্পীর চোখে নারী-পুরুষের শরীর দেখার সুযোগ তার হয় নি। সুন্দর তার কাছে অনুপস্থিত। তার ইহকাল ও পরকাল জুড়ে অসংখ্য নারী আছে, যারা কেবলই ভোগ্যবস্তু, সেবাদাসী, যাদের ধর্ষকরাও ফতোয়া দেয় বোরকা পরার। ফলে, নারীর শরীর যৌন সহিংসতার লক্ষ্য হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানশিক্ষা বঞ্চিত, নান্দনিকতাবোধ বঞ্চিত, ধর্মসংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা পুরুষটি ধর্ষকামী অসুস্থতা নিয়ে বিকৃত যৌনচেতনার অধিকারী হয়।

চার. অপরাধের বৈধতা, শাস্তিদাতার ভূমিকায়

মেয়েদের প্রতি ভয় ও ঘৃণা, প্রতিশোধকামিতা, অতঃপর বিকৃত যৌনচেতনা ও ধর্ষকামী অসুস্থতা থাকলেই কি সে ধর্ষক হয়ে উঠবে? আরো এক ধরনের চিন্তা তার মধ্যে থাকতে হবে, এককথায় সেটি হচ্ছে, 'ব্লেমিং দ্য ভিকটিম'। অর্থাৎ, তাকে তার সহিংসতার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে হবে, তার অপরাধের বৈধতা দেবার জন্য। এজন্য যুক্তি দিয়ে তার 'শিকার'কে কোনো না কোনোভাবে 'দোষী' সাব্যস্ত করতে হবে। এমন সব অজুহাত তাকে দাঁড় করাতে হবে, যা তার নিজের সমাজে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য 'দোষ' হবে। স্বর্গ থেকে বিদায়ের আদিপাপের অনুরূপ কোনো 'দোষ' কিংবা 'পাপ' আবিষ্কার করতে হবে, কাল্পনিক হলেও।

সে ভাবনা শুরু করবে, 'মেয়েটি যদি একা না থাকত, তাহলে সে প্ররোচিত হতো না, দোষটি মেয়েটির, সে কেন একা বাইরে বেরিয়েছে?' অথবা, 'সে যদি ওরকম কাপড় না পরত তাহলে ওর দিকে তাকাতাম না, ও কেন ওরকম কাপড় পরেছে?' অথবা, 'সে হেসেছিল কেন, তার মানে সে আগ্রহী এবং তারপর আমাকে না করার সাহস দেখিয়েছে, মেয়েদের এই সাহস খুবই খারাপ।' ঘরের বাইরে আসার, পোশাকের ও পর্দার অজুহাত খুব যুতসই, মেয়েটিকে দোষী ভাবা ও তাকে 'শাস্তি' দেওয়ার বৈধতার জন্য।

ফেসবুকে, গল্পে, সিনেমায়, পত্রিকার সংবাদে, ওয়াজ মাহফিলের বয়ানে, নারীকে 'দোষী' ও 'দায়ী' করে যে বক্তব্য দেওয়া হয়, ধর্ষক সেগুলোকে মনে মনে আওড়ায় এবং নিজের অপরাধের পক্ষে যুক্তি হিসেবে বিবেচনা করে। সকল পুরুষ, যারা নারীকে শায়েস্তা করতে চায়, সে এখন নিজেকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে কল্পনা করে। সে যেমন সকল পুরুষের প্রতিনিধি, তার শিকার নারীটিও সকল 'খারাপ' বা 'দোষী' নারীর প্রতিনিধি হয়ে ওঠে তার কল্পনায়। সমাজের অনেক পুরুষ তার পক্ষে, ফলে এই নারীদের 'শাস্তি' দেওয়ার অধিকার তার আছে, এই ভাবনা সহিংসতাকে বৈধতা দেয় এবং সে অনুযায়ী ন্যায্যও মনে হয়।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে একবার একজন মধ্যবয়সী, ধর্ষণের অভিযোগে জেল খাটা কয়েদির সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। একদিন গ্রামের বাজারে অনেক লোকের সামনেই এক তরুণীকে আমগাছের লাকড়ি দিয়ে সে বেদম পিটিয়েছিল। এই 'শাস্তি' দেওয়ার অন্যতম যুক্তি ছিল– 'মেয়েটি ভালো নয়, সে আমাদের গ্রামের ইয়ং ছেলেদের নষ্ট করবে'। সে খুব গর্বের সঙ্গে তার সামাজিক দায়িত্ব, ইয়ং ছেলেপেলেদের চরিত্র রক্ষা করার ভূমিকার বর্ণনা করেছিল। অবশেষে, মেয়েটিকে সে চরম 'শাস্তি' দিয়েছিল।

এই 'শাস্তি' দেওয়ার যুক্তি সে মাতৃগর্ভ থেকে নিয়ে আসে নি, তার সমাজ থেকে পেয়েছে। বাংলাদেশে, প্রধানত ইসলামি রাজনীতির পরিবেশনায় এই শাস্তির বিশেষায়িত রূপ আমরা দেখেছি ১৯৭১ সালে। এরপর একটি জনগোষ্ঠীকে 'শাস্তি' দেওয়ার জন্য ধর্ষণের ব্যবহার আমরা ২০০২ ও ২০০৩ সালেও দেখেছি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের প্রতি। বাংলাদেশের ধর্ষণ পরিসংখ্যানে এই দুই বছরের ধর্ষণের উচ্চমাত্রা রাজনৈতিক কারণে, শাস্তির যুক্তিতে। মালেগনিমতের ভোগলিপ্সা, কিংবা শাস্তি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাই শেষ কথা নয়, নারীর প্রতি সহিংসতার আরেকটি শর্ত 'ক্ষমতা'। ধর্ষক জানে তার 'ক্ষমতা' আছে।

পাঁচ. ক্ষমতার হিসেবনিকেশ, শাস্তির ঝুঁকি নেই

ধর্ষক অপরাধের পরিকল্পনা করে এই ক্ষমতাকে বিবেচনায় নিয়ে। সে ভোগলিপ্সায় অন্ধ কিংবা নারীকে তার প্রাপ্য শাস্তি বুঝিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর, বটেই। কিন্তু তার পরিকল্পনায় সে জানে যে তার সহিংসতাও এক ধরনের অপরাধ, অসামাজিক ও বেআইনি। সে সমাজের অন্য আরেকটি নৈতিকতা, নারীর প্রতি সহিংসতা যে অন্যায়, তাও জানে। সে জানে ধরা পড়লে তার বিচার হতে পারে, এই ঝুঁকিও তার জানা।

এই ঝুঁকি নিরসনের জন্য সে তার শারীরিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পেশাগত ক্ষমতার হিসেব নিকেশ করে। সে একা হলে তার মতো আরো কয়েকজনকে নিয়ে যূথবদ্ধ হয়। দলগত ধর্ষণের কারণ এটাই। শিশুদের ওপর যে আক্রমণ, তার কারণ শারীরিকভাবে একটি শিশু এই ধর্ষকের চেয়ে দুর্বল, এটা সে হিসেব করে। সমাজে তুলনামূলক ক্ষমতাহীন যারা, তারাই প্রথমে শিকার হয়ে থাকে; দরিদ্র ও জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু নারী, শিশু এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য কর্মী।

সে আশা করে যে, সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে পুলিশের গ্রেফতার থেকে বেঁচে যাবে। ভালো উকিল লাগিয়ে, বিচারককে ঘুষ দিয়ে, অর্থাৎ টাকা দিয়ে সে বিচার কিনে নিতে পারবে। সে এই ঝুঁকি নিরসনের ক্ষমতার হিসেবনিকেশ করেই সিদ্ধান্ত নেয়। ধনী পরিবারের সন্তান, রাজনৈতিক দলের ক্যাডার, মাদ্রাসা বা স্কুল কলেজের শিক্ষক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর পেশাগত অবস্থানও এক ধরনের 'ক্ষমতা', যা দিয়ে সে ভাবে যে তার 'শিকার'কে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

এ তো গেল ইহজাগতিক হিসেবনিকেশ। পারলৌকিক হিসেবনিকেশও আছে, যা ধর্মনৈতিক ঝুঁকি, পাপকার্যের জন্য পরকালের শাস্তির ব্যাপার। এখানেও সম্পদের ভূমিকা আছে। যদি তার টাকা থাকে সে হজে যাবে, যখন একটু বয়স হবে। হজ থেকে ফিরে এলে সে শিশুর মতো পবিত্র হয়ে পরকালে বেহেস্তে চলে যাবে। হজে গেলে যে সব পাপ ধুয়ে মুছে যায়, তা কে না জানে, বাংলাদেশে?

এইসব কল্পনা, বৈধতার যুক্তি, ঝুঁকি ও শাস্তির থেকে রেহাই পাওয়ার 'ক্ষমতা'র হিসেবনিকেশ শেষ হলে সে পরিকল্পনা শেষ করে। সিদ্ধান্ত নেয়, কখন, কোথায়, কীভাবে সে শিকারকে ধরবে। সে যদি নিশ্চিত হয়, সে এই অপরাধ করে পার পেয়ে যাবে, সে তার ক্ষমতা ও টাকা ব্যবহার করে শাস্তি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে, তাহলে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগোবে। হতে পারে, এই পুরো ভাবনার প্রক্রিয়াটি ৩০ দিনের কিংবা ৩০ মিনিটের, অবস্থাভেদে। কিন্তু কোনো ধর্ষকই কেবল হরমোনের কারণে, কোনো ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই, পরিকল্পনা ছাড়াই, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্ষণ করে না।

ছয়. সামাজিক সত্তাই চেতনাকে নির্ধারিত করে, সমাজবিজ্ঞানের পন্থা দিয়ে অনুসন্ধান

উপরে যে বিকৃতকামী অপরাধীর মগজের মানচিত্র দেখছি, এই ব্যক্তিরা কিন্তু একটি সমাজে জন্মায়। সেই সমাজটিকে না দেখলে, এই ব্যক্তির বিকৃতকামিতার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের কারণ জানা যাবে না। ব্যক্তিকে জানার জন্য যেমন মনোবিজ্ঞান দরকার, তেমনি ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বোঝার জন্য সমাজবিজ্ঞান দরকার। সমাজবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার জন্য প্রথমেই সমাজবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জানা ও তা ব্যবহার করার চর্চা থাকতে হবে।

সমাজবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কিছু পদ্ধতি আছে। প্রথমেই তথ্য, মিথ বা রূপকথা, মতামত ও অনুমান এই চারটি বিষয় আলাদা করতে হবে। ফ্যাক্টস, মিথ, ওপিনিয়ন এবং এজাম্পশন। তথ্য মানে খাঁটি তথ্য। বাংলাদেশে শহরের রাস্তায় ৮০ শতাংশ হিজাবি নারী আছে (আন্দাজে বললাম)। তথ্য সংগ্রহ করে একটি সংখ্যা পাওয়া যাবে, যে ব্যাপারে আমরা সবাই একমত হব। যদি বলি ৮০ শতাংশ মৌলবাদী নারী আছে। তাহলে এটি তথ্য নয়, মতামত। কারণ, হিজাব পরলেই মৌলবাদী নাও হতে পারে। কেউ ছেলেবন্ধুর সাথে লুকিয়ে প্রেম করার জন্যও হিজাব পরতে পারে।

মিথ কী? গাধার মতো শরীর ও নারীর মতো মুখওয়ালা একটি প্রাণী আছে, যা উড়তে পারে। হনুমান বলে একটি প্রাণী ছিল যে একহাতে হিমালয় তুলে নিতে পারে। হাতির গলা কেটে মানবশিশুর মাথায় বসিয়ে দেওয়া যায় কিংবা মেরিমাতা ঈশ্বরের ইচ্ছায় গর্ভধারণ করেন। এইসব রূপকথা বা অতিকথা বা গুজব তৈরি করা হয়। অনেকে তা বিশ্বাস করে।

ছেলেদের ওপর যৌন নির্যাতনের তথ্য অনেক আছে। এই তথ্য থেকে কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে পুরুষ নির্যাতন রয়েছে? দু-একটা ঘটনা আছে, নারী কর্তৃক প্রতিবেশী ধর্ষকের বিশেষ অঙ্গ কর্তন। এই ঘটনাকে কি নির্যাতন না প্রতিরোধ নামে ডাকবেন? আসলে কি নির্যাতন? নাকি প্রতিরোধ? নাকি আত্মরক্ষা? এই যে কোনো তথ্যকে বিভিন্ন নাম দিচ্ছি, এটা কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বা পদ্ধতি সমাজবিজ্ঞানের। নাম দিয়ে কী আসে যায়? হ্যাঁ, নাম দিয়ে খুব মৌলিক ঘটনা ঘটে। কে কী নাম দিচ্ছে, সেটা খুব মৌলিক, আমাদের চিন্তা-ভাবনায়, রাজনীতিতে। আত্মরক্ষাকে সহিংসতা ও সহিংসতাকে আত্মরক্ষা নাম দিলে সমস্যা ঘটে মৌলিক উপলব্ধিতে।

পাওলো ফ্রেইরি ডায়ালগ বলতে বুঝিয়েছেন, মানুষে মানুষে এই 'নাম' নিয়ে আলাপ সালাপ। আপনি যে নামে কোনো ঘটনা বর্ণনা করলেন, আমি সেই নাম মেনে নিলে কোনো ডায়ালগ হবে না। আমি যদি ভিন্ন নাম দিতে পারি, সেটাই আমার কণ্ঠস্বর। নাম দেওয়া মানে রি-ডিফাইন করা। নাম দেওয়া মানে ভিন্নভাবে চিন্তা করা।

এই ক্ষেত্রে উপলব্ধির গভীরতায় যেতে হলে, স্টিল ছবি থেকে ভিডিওতে যেতে হবে। স্টিল ছবি মানে, বাস্তবে, আক্ষরিক অর্থেই কোনো নারী কোনো পুরুষকে আঘাত করতেই পারে। এই যে স্টিল ছবিটা, এটাকে একটা ভিডিওতে দেখলে দেখা যাবে নারী-পুরুষের একটি ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব আছে। অনেকদিন থেকেই। এই পুরুষ ও সাহসী নারীর একটা দ্বন্দ্বের ইতিহাস আছে। এটাকে বলে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'। অন্যভাবে বললে, সমাজবিজ্ঞানে 'জেনিয়ালজিকাল অ্যাপ্রোচ' নামে একটি পদ্ধতি আছে, যা এই দ্বন্দ্বের বিবর্তন ব্যাখ্যা করে।

তাহলে, আজকে আমরা যে বিকৃতকামী সহিংসতা দেখছি, এটি আসলে কী? এর স্বরূপ বা প্রকৃতি কী? সমাজবিজ্ঞানের আলোকে দেখলে?

সকল ধরনের বিকৃতকামী সহিংসতা একটি সামাজিক মৌলিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ। দ্বন্দ্বটি হচ্ছে, পিতৃতন্ত্রের সাথে নারী ও শিশুর দ্বন্দ্ব। নারী ও শিশুর প্রতি বিকৃতকামী পুরুষের সহিংসতাও একটি দ্বন্দ্ব। আপাত চেহারায় নির্যাতক/ঘাতক পুরুষ নারী ও ছেলেশিশুর প্রতি সহিংসতা করছে। এটিও একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব। পিতৃতন্ত্রের সাথে নারী/শিশুর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এখানেও দ্বন্দ্ব ভোগ, মালিকানা ও আধিপত্য নিয়ে, যার প্রকাশ যৌন সহিংসতায়। পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ চায় সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ, নারী ও শিশু চায় স্বাধীনতা ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি।

পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে দাস সমাজে। সামন্তবাদী সমাজে এটা একরকম ছিল, পুঁজিবাদী সমাজে যা ভিন্নরকম। বিকশিত পুঁজিবাদ আর প্রান্তিক পুঁজিবাদের পিতৃতন্ত্রও আলাদা। দ্বন্দ্বটা পিতৃতান্ত্রিক, যার প্রকাশ নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। সামন্তযুগে আধিপত্যকারী পৌরুষ পয়দা করেছে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিকায়ন। পুঁজিবাদে প্রতিশোধকামী ঘ্যানঘ্যান করা কাপুরুষ তৈরি করছে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিকায়ন। কারণ, পুঁজিবাদ মানে প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় নারীরা অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে এখন অনেকে অনুযোগ করে, 'দ্যাখো বাবা, ওই মেয়ে আমারে মেরে ফেলল'। প্রশ্ন করে, 'সম্মান করব কেন? মেয়েরা কি বস হয়ে গেল নাকি?'

বাংলার ডাকাত পুরুষরা মা কালীকে পূজা দিয়ে, রামদাও হাতে ধনী গৃহস্থের ঘরে গিয়ে বলত, 'মা আপনার গয়না দিন'। এই হচ্ছে আধিপত্যকারী পৌরুষ। মেয়েদের সম্মান করা পুরুষের দায়িত্ব; এই জন্য নয় যে মেয়েরা শক্তিশালী, বরং উলটো, পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বাসে নারীরা অবলা, তাকে রক্ষা করা পুরুষের কর্তব্য। এটি সামন্ত সংস্কৃতির। সামন্ত উৎপাদন প্রণালি বদলেছে, পুঁজিবাদে। ব্যবস্থা বদলের সাথে নারী-পুরুষ সম্পর্ক বদলেছে। তাই নতুন পৌরুষবোধ প্রতিযোগী, প্রতিশোধকামী। আগের সেই আধিপত্যকামী পৌরুষবোধ বদলে যাচ্ছে। নারীরা প্রতিরোধ করছে, সশস্ত্র ও সহিংস উপায়েও।

সমাজবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের একটি মৌলিক পদ্ধতি কারণ অনুসন্ধান। তথ্য নিলেন, সেই তথ্য বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সম্পর্কিত করলেন, কেবল স্টিল ছবি না দেখে ভিডিও দেখলেন, ভিন্ন নামে ভাবলেনও, কিন্তু কী কী কারণে এই বাস্তব বা কাল্পনিক সহিংসতা? তা অনুসন্ধান প্রয়োজন। আন্দাজে বা লোকমুখে শুনে কেউ একটিমাত্র কারণকেই নিরন্তর আওড়াতে থাকে, যেটি তার ভালো লাগে; যেমন, 'নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ দেশে সুশাসন নেই'।

একটি একক কারণে কিছু ঘটে না, বহু কারণের দরকার হয়। কিছু কারণ ভিত্তিগত, কিছু কারণ শর্তগত। মুরগির ডিম থেকে মুরগির বাচ্চা কেন হয়? কারণ মুরগির ডিমের সেই জেনেটিক ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু পানিতে চুবিয়ে রাখলে বাচ্চা হবে না। তাপ দিতে হবে। এই তাপ দেওয়াটা শর্ত। ডিমের মতো এক খণ্ড পাথরকে তাপ দিলে বাচ্চা হবে না, কারণ পাথরের জেনেটিক ভিত্তি নেই। নানা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ফ্যাক্টর থাকে। কেউ বলে ড্রাইভিং এবং অ্যানাবলিং ফ্যাক্টরস। মোদ্দা কথায়, পিতৃতান্ত্রিক দ্বন্দ্ব বিকাশের বহু কারণ আছে, একটা না।

সাত. বিকৃতকামিতার প্রজনন, সামাজিকায়ন প্রক্রিয়া

আজকের বিকৃতকামী ছেলেটি কিন্তু অন্যরকম হতে পারত। সে একজন সংবেদনশীল, যত্নশীল, প্রেমিক পুরুষ হতে পারত। কীভাবে?

বয়ঃসন্ধিতে সে যদি প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা পেত। সে যদি নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের বিষয়টি রোমান্টিক প্রেমের সম্পর্ক হিসেবে জীবনের অন্যতম আনন্দের বিষয় হিসেবে জানত। সে যদি মানব মানবীর সম্পর্কের সামাজিক ইতিহাস ও বিবর্তন বুঝত। সে যদি নারী-পুরুষ সম্পর্কের, জেন্ডার রাজনীতির, নারী-পুরুষ বৈষম্যের বাস্তবতা জানত।

তার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের। তার প্রয়োজন ছিল অভিজ্ঞতার, বাস্তবিক মেয়েদের সাথে বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতার, ব্যক্তি হিসেবে নারীকে বোঝার শিক্ষা ও সুযোগ। দুর্ভাগ্য কেবল সহিংসতার শিকার মেয়েটির নয়, দুর্ভাগ্য ওই ছেলেটিরও যে এমন একটি সামন্ত ও ধর্মান্ধ সমাজে জন্মেছে যেখানে মানুষ হয়ে ওঠা বেশ দুরূহ।

একদিকে তার হরমোন নিয়ে যে অভিজ্ঞতা, তা বিজ্ঞানের আলোকে জানার কোনো সুযোগ সে পায় নি, অন্যদিকে নারীকে সম্মান করার সংস্কৃতির পরিচয় সে জানে না। তার পরিবার চায় সে ক্ষমতাবান উপার্জনকারী হয়ে উঠুক, স্থানীয় রাজনীতিবিদ চায় সে তার দলের ক্যাডার হয়ে উঠুক, পুঁজিবাদ চায় সে নিজে ক্রেতা ও তার শ্রম পণ্য হয়ে উঠুক, মৌলবাদী ধর্মব্যবসায়ী চায় সে তার আয়ের উৎস হয়ে উঠুক মাদ্রাসায় এসে ও ওয়াজ মাহফিলে যোগ দিয়ে। যত বেশি সমাবেশ তত বেশি চাঁদা ও আয় ধর্মব্যবসার।

কিশোর বলতে ইংরেজিতে টিন-এজার, থার্টিন থেকে নাইনটিন, এই বয়সকালকে বোঝানো হয়। বারো বছর থেকে আঠারো বছর বয়সকেও 'কৈশোর' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমাজভেদে দশ/এগারো বছর বয়স থেকে ষোলো বছর পর্যন্ত কৈশোর। এই বয়সেই ঘটে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, যা ভূমিকা রাখে ব্যক্তির পরবর্তী গোটা জীবনেই। এই সময়ের আবেগ, অনুভূতি, দক্ষতা, প্রভাব রাখে তার মনন ও পেশাতেও।

কৈশোরের শুরুতে মস্তিষ্ক এক ধরনের হরমোন মোচন করে বা ছেড়ে দেয়। এটাকে বলে গনাডোট্রপিন-মোচন হরমোন (GnRH)। এর ফলে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড কাজ শুরু করে। সে ফলিক্লে-স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) এবং লুটেইনিজিং হরমোন (LH) রক্ত প্রবাহে ছেড়ে দেয়। এই হরমোন কিশোর ও কিশোরীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন-ভিন্নভাবে কাজ করে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হরমোন ইস্ট্রোজেন উৎপাদন করে, যা নারীদেহের ডিম্বাশয়ে ডিম উৎপাদনের সংকেত দেয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে এটি টেস্টোস্টেরন উৎপাদন করে, যা শুক্রাণু তৈরিতে ভূমিকা রাখে। ধারণা করা হয়, ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন এবং টেস্টোস্টেরন– এই তিন ধরনের হরমোনের ফলেই কৈশোরের দৃশ্যমান শারীরিক পরিবর্তনগুলো ঘটে থাকে। মেজাজ, আবেগ, ঝোঁক ও চারিত্রিক প্রবণতার জন্য অনেকেই এসব হরমোনের ভূমিকা প্রধান বিবেচনা করেন।

হরমোন শারীরিক অনুভূতি তৈরি করে, কিন্তু আচরণ নয়। হতে পারে হরমোন তীব্র শারীরিক তৃষ্ণা তৈরি করে, কিন্তু সেই তৃষ্ণা নিবারণ গোমূত্র খেয়ে, নর্দমার নোংরা জল খেয়ে, নাকি টিউবওয়েলের

বিশুদ্ধ জল খেয়ে মেটানো হবে, সেটি নির্ভর করে ব্যক্তির রুচি ও সিদ্ধান্তের ওপর। এই সিদ্ধান্ত আবার নির্ভর করে ওই ব্যক্তির সামাজিকায়ন বা সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার ওপর। এই সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, বোধ, রুচি ইত্যাদি আবার নির্ভর করে পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষায়। ফলে 'হরমোন' যৌন আবেগের শারীরিক ভিত্তি হলেও এই আবেগ প্রকাশের আচরণ ও ভাষা তৈরি করে সংস্কৃতি, এক কথায় সামাজিকায়ন।

কিশোর ছেলেটির শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁর মানসিক পরিবর্তনও ঘটে। সে শারীরিকভাবে 'পুরুষ' হয়ে ওঠার পাশাপাশি মানসিকভাবে 'পুরুষালি' আচরণ শুরু করবে। বাংলা ভাষায়, পুরুষালি আচরণকে পুরুষের আচরণ হিসেবেই প্রকাশ করা হয়, আলাদা কোনো শব্দ নেই। ফলে শারীরিক পুরুষ আর সামাজিক পুরুষালি ব্যপারটার পার্থক্য আমরা অনেক সময় গুলিয়ে ফেলি।

মানসিক পরিবর্তন, মানে মানসিকভাবে এই ছেলেটি কেমন পুরুষ হয়ে উঠবে, ঘাতক, ধর্ষক, কাপুরুষ নাকি মানবিক পুরুষ, তা নির্ভর করে তার চারপাশের মানুষ ও তার পরিবার কি 'প্রত্যাশা' করছে, তাকে কী ধরনের 'পুরুষালি' আচরণ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তার ওপর। 'পুরুষ' হিসেবে একটি ছেলের কাছে যে 'পুরুষালি' ভূমিকা প্রত্যাশা করা হয়, এই সামাজিক ভূমিকা 'পৌরুষ' বা মাসকুলিনিটি। এই একই সমাজের মানুষ আবার একটি মেয়ের কাছ থেকে ভিন্ন সামাজিক ভূমিকা প্রত্যাশা করে, যা 'মেয়েলি'। এই সামাজিক ভূমিকাকে বলা হয় 'নারীত্ব'। পুরুষালি ও মেয়েলি আচরণ, যা ভিন্ন ও বিপরীত, তা সামাজিক প্রত্যাশা ও শিক্ষার ফল।

এই যে পুরুষালি ও মেয়েলি আচরণের কথা বলছি, সেটি কি হরমোনের ব্যাপার? শারীরিক বা প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত? নাকি সমাজ সংস্কৃতির প্রভাব?

নৃতত্ত্ববিদ মার্গারেট মীড, আমাদের জানান যে, পুরুষালি বা মেয়েলি আচরণ, পুরোটাই সাংস্কৃতিক কারণে। তথাকথিত সভ্যতা থেকে দূরে, কয়েকটি আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা গবেষণা করতে গিয়ে মীড আবিষ্কার করেন যে, একটি নৃগোষ্ঠীর সকল নারী-পুরুষের আচরণ শান্তিপূর্ণ, যা মার্কিনীদের কাছে 'মেয়েলি'। অপর একটি নৃগোষ্ঠীর সকল নারী-পুরুষের আচরণ আগ্রাসী ও সহিংস, অন্য কথায় 'পুরুষালি'। অন্য একটি নৃগোষ্ঠীর নারীরা আগ্রাসী ও সহিংস কিন্তু পুরুষেরা শান্তশিষ্ট। একটি সমাজে সবাই 'মেয়েলি', একটি সমাজে সবাই 'পুরুষালি' এবং অন্য একটি সমাজে নারীরা 'পুরুষালি' এবং পুরুষেরা 'মেয়েলি'।

এই গবেষণা থেকে অন্তত এটা বোঝা যায় যে, এই পুরুষালি বা মেয়েলি আচরণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে গড়ে ওঠে, হরমোনের কারণে নয়। (হরমোন সমস্যার কারণে একটি ক্ষুদ্র অংশের ব্যতিক্রমী শারীরিক বিকাশ হতে পারে, ব্যতিক্রম কিন্তু সেটা অপ্রাকৃতিক বা আন-ন্যাচারাল নয়।) শিকারি নৃগোষ্ঠী ও কৃষিজীবী নৃগোষ্ঠীর আচরণের পার্থক্য তাদের কর্মসংস্কৃতির পার্থক্য। কর্মসংস্কৃতির পার্থক্যও নারী-পুরুষের সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।

আদিবাসী সমাজের বিপরীতে, প্রায় সকল শ্রেণি ও পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতিতেই পুরুষ হচ্ছে কর্তা, আধিপত্যকামী, আগ্রাসী ও সহিংস এবং নারী হচ্ছে বাধ্যগত, সহনশীল ও লাজুক। এই সমাজে ছেলেশিশুর কাছে থেকে প্রত্যাশা করা হয় সাহস, দায়িত্বশীলতা ও প্রভাব এবং আগ্রাসী ও সহিংস

আচরণ। অন্যদিকে মেয়েশিশুর কাছে প্রত্যাশা করা হয় কর্তব্যপরায়ণতা, আনুগত্য ও লজ্জা এবং বিনয়ী ও সহনশীল আচরণ। পারিবারিক শিক্ষা ও ধর্মসংস্কৃতি এই পুরুষালি বা মেয়েলি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

কিশোর ছেলেটির কাছ থেকে পরিবারের যা প্রত্যাশা, সে কি কেবল সেই আচরণই করবে? কৈশোরকালীন মানসিক বিকাশে বৃহত্তর সমাজের, বন্ধুদের, আত্মীয়দের, গণমাধ্যমের ও স্কুলের ভূমিকাও রয়েছে। ভূমিকা রয়েছে তার নিজের মানসিক সক্ষমতা (আয়োডিন ঘাটতি) ও শৈশবকালীন ব্যক্তিত্বের। আসলে এই আয়োডিন ঘাটতি বা শৈশবকালীন ব্যক্তিত্বও এই সামাজিক প্রেক্ষিতজাত, যে প্রেক্ষিত আজ বিশ্বায়িত এবং যোগাযোগপ্রযুক্তিতে ঘনিষ্ঠ ও অতি নিকটের।

আট. সামাজিক প্রেক্ষিত, রাষ্ট্রের ভূমিকা

পিতৃতান্ত্রিক ধর্ষকামী বিশ্বাস, প্রথা, সংস্কৃতি ও আইনি প্রতিষ্ঠান বহাল থাকা মানে নারীর প্রতি সহিংসতা তৈরির প্রেক্ষিত টিকে থাকা। এটি টিকিয়ে রাখা বা না-রাখার ক্ষমতা রাষ্ট্রের রয়েছে। নারীকে গৃহবন্দি করে রাখা, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা, হেয় প্রতিপন্ন করা, ভোগ্যবস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা ও 'মালেগনিমত' আখ্যা দেওয়ার ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের যে প্রচারণা রয়েছে, এই প্রচারণাকে অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা রাষ্ট্র রক্ষা করে চলেছে। নারীর প্রতি সহিংসতার অন্যতম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎস এবং আইনি কাঠামো পরিবর্তন না করে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আইনি কাঠামো নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করার কাজ রাষ্ট্রের।

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন ও হত্যার মাত্রা ক্রমবর্ধমান। সম্প্রতি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী, সংস্কৃতিকর্মী সোহাগী জাহান তনুকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বাংলাদেশে সবচেয়ে নিরাপদ বলে বিবেচিত সেনানিবাস অঞ্চলেও নারী নিরাপদ নয়। নারী নিরাপদ নয় হিজাব পরে থাকলেও। তনু হত্যার বিচার হয় নি কেন?

নারীর প্রতি সহিংসতাকে প্রতিরোধ করার জন্য অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের কর্মচারীদের। নারীর প্রতি সহিংসতার ক্রমবৃদ্ধি এটাই প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। এই অক্ষমতার দায়ভার প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীরা এড়াতে পারেন না। প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনের ফাঁকফোকর ও দীর্ঘসূত্রিতার ব্যাপার যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ঘুষ ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অপরাধীকে সুযোগ দেওয়া ও পরবর্তী অপরাধ সংঘটনের সাহস ও পরোক্ষ অনুমতি দেওয়া।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণে সরকারেরও ভূমিকা রয়েছে। একটি সমতাভিত্তিক, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত, সংবিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ, নারীনীতি প্রণয়নে সরকারের ভূমিকা ছিল। কিন্তু নারীনীতি বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণে এটি কেবল কাগুজে নীতি হয়েই থেকে যাচ্ছে। অন্যধারে, বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কারের নির্বাচনী অঙ্গীকার আজো বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। মৌলবাদী ধর্মসন্ত্রাসীদের পছন্দের বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন নারীর প্রতি সহিংসতার আইনি প্রেক্ষাপট তৈরি করে। এ ক্ষেত্রে সরকারের কোনো দৃঢ় ভূমিকা নেই। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, নারীবিদ্বেষী বিকৃতকামীদের উৎসাহিত করে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বিজ্ঞানভিত্তিক যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার রয়েছে অনুপস্থিত, ফলে একদিকে ধমান্ধদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রচার ও অন্যদিকে পুঁজিবাদী পর্নোগ্রাফির প্রভাবে, বিকৃত যৌনবোধ নিয়ে বেড়ে উঠছে শিশুকিশোর। স্কুলে ও পরিবারে সুস্থ, বিজ্ঞানমুখী, নারী-পুরুষের সমতার মূল্যবোধের বদলে ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার পাঠ চলছে। পুরুষাধিপত্যের প্রথা ও প্রতিষ্ঠান নারীর প্রতি সহিংসতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণকে বহাল রাখছে ও শক্তিশালী করছে। শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর ও তার অনুকূল সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরি করার দায় প্রধানত রাষ্ট্রের।

নয়. হোক প্রতিবাদ, অপরাধীর বিচার চাই

আইনি ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে অপরাধীরা উৎসাহিত হয় এবং অপরাধের মাত্রা বেড়ে যায়। অপরাধীকে অবশ্যই আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তাকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের ওপর সামাজিক চাপ প্রয়োগের বিকল্প নেই। প্রতিবাদী মানুষের সংহতি ও শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠলে, মানুষ সোচ্চার হলে, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ব্যাপকতা কমবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূল করার লক্ষ্যে প্রধান দাবি হতে পারে তিনটি–

১. ঘাতক-ধর্ষক-অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতার, দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তি দিতে হবে;

২. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং নারী অধিকার সনদের সাথে সংগতিপূর্ণ জাতীয় নারীনীতি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে;

৩. মধ্যযুগীয় বর্বর বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন বাতিল করে সংবিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ আইন প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে অনেক কথা ও প্রকল্প হচ্ছে, কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেদের নিয়ে কি এই সমাজ ও রাষ্ট্র কিছু ভাবছে? তেমন কিছু না। তা ছাড়া, নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকার স্বীকৃতি।

আমরা ব্যক্তি ধর্ষকদের প্রতি ঘৃণাভরে চরম শাস্তির কথা বলছি, কিন্তু নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন (পারিবারিক আইন), পিতৃতান্ত্রিক প্রথা, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা, মৌলবাদী ধর্মশিক্ষা, ইত্যাদি সামাজিক প্রেক্ষিতের বিরুদ্ধে কি সোচ্চার হচ্ছি? আমরা কি বিকল্প প্রস্তাব করছি এসব ব্যবস্থার, যেখানে একটি ছেলে ধর্ষক নয়, সংবেদনশীল মানুষ হয়ে উঠবে?

প্রতিবাদ হোক। #মি-টু ধরনের আন্দোলন হোক। নারী ও পুরুষেরা সহিংসতার বিরুদ্ধে আরো সোচ্চার হয়ে উঠুক। তবে কেবল প্রতিবাদ দিয়ে পিতৃতন্ত্রের সাথে নারী ও শিশুর দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবে না।

নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার চাইতে হবে, কঠোর শাস্তির দাবিও তুলতে হবে, কিন্তু এই ধর্ষক উৎপাদনের প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হলে আমাদের এই সমাজ ও সংস্কৃতি, যা ধর্ষক উৎপাদন করে চলেছে, সেই ব্যবস্থা বদলের আওয়াজও তুলতে হবে বিকল্প পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার

রূপকল্প দিয়ে। সেই উদ্যোগ যত দ্রুত গৃহীত হবে, ধর্ষণের বিভীষিকা থেকে তত দ্রুত আমরা বেরিয়ে আসতে পারব।

১০. পিতৃতন্ত্রের বিলোপ হোক, নারী-পুরুষ সাম্যের সমাজ গড়ে উঠুক জনউদ্যোগে

পরিবর্তনের সূচনা হোক ঘর থেকেই। মেয়েদের সামাজিকায়ন হোক ভিন্নভাবে, আত্মরক্ষার অধিকার ও সক্ষমতার বোধ সঞ্চারিত করে। কারাতে শেখার সুযোগ থাকুক প্রতিটি মেয়ের, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি। আত্মরক্ষার কৌশল সব মানুষেরই জানা থাকা উচিত, এমনকি ছেলেশিশুদেরও। সাঁতার জানা উচিত, বন্দুক চালানো জানা উচিত, গাছে চড়তে শেখা উচিত, সাইকেল ও গাড়ি চালাতে পারা উচিত।

কিছু মনস্তাত্ত্বিক বিষয়েও জ্ঞান থাকা উচিত, যা আত্মরক্ষার জন্য জরুরি; যেমন, দুর্বলতা বা ভয় প্রকাশ না করা। এটি সহজ হয়, যদি শরীরী ভাষায় জানিয়ে দেওয়া যায় যে, নিপীড়ন মেনে নেওয়া হবে না। নিপীড়ক ইন্সটিংক্টিভলি প্রথমে যাচাই করে, সে প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে কি না। যদি সে শরীরী ভাষায় জানে যে ভিকটম ভীত, নিপীড়ক আরো উৎসাহিত হয়। কিন্তু যদি দেখে যে চোখে ভয় নয় অন্য কিছু আছে, আক্রমণকারী পিছু হটে। আত্মরক্ষার সক্ষমতা গড়ে উঠুক পরিবার থেকেই।

তবে পিতৃতন্ত্র বিলোপের জন্য কেবল আত্মরক্ষা যথেষ্ট নয়। বদলে দেওয়া দরকার পিতৃতান্ত্রিক সামাজিকায়ন। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধের জন্য পারিবারিক শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা অপরাধীর শাস্তি দিতে পারে যদি চায়, কিন্তু ঘাতক-ধর্ষক উৎপাদনের শিক্ষা বা সামাজিকায়ন পরিবার থেকেই হতে পারে। কিশোর ছেলেটি যাতে ঘাতক-ধর্ষক না হয়ে ওঠে, সে যাতে নারীর প্রতি সমানুভূতি ও সম্মানবোধ নিয়ে বেড়ে ওঠে, সচেতন সে চেষ্টা পরিবারের অভিভাবকদের থাকা দরকার। কিশোরদের মানবিক, বৈজ্ঞানিক ও নান্দনিক শিক্ষার আয়োজন করতে হবে বয়স ও প্রয়োজন বিবেচনায়, পরিবারের ভেতরেই।

কৈশোরকালীন মানসিক বিকাশে, মানসিক রূপান্তরে, পুরুষ হয়ে ওঠার সামাজিকায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হলে হরমোন নয়, পিতা-মাতাকে বিবেচনায় নিতে হবে এই সামাজিক প্রেক্ষিতকে। কিশোরদের চিন্তাভাবনা করতে হয় পরিবেশের সাথে তার সংগতি বিধানের প্রয়োজনে। ফলে, পরিবেশের প্রভাব চিন্তায় পড়বেই। বয়ঃসন্ধিকালে কোনো কিশোর ভাবতে পারে, সে একা। কেউ নেই যাকে সে নিজের শারীরিক ও আবেগ অনুভূতির কথা বলতে পারে, অথচ তার অনেক প্রশ্ন রয়েছে। ভাবতে পারে, সে অরক্ষিত, কারণ ঘরের বাইরে বাবা-মা, ভাই-বোন বা নিকটাত্মীয় কারো সাহায্য পাবে না, বিপদে পড়লে। পরিবার আর মানসিক 'আশ্রয়' নেই, কারণ মনের কথা বিনিময় হয় বন্ধুদের সাথে কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। বাবা-মায়ের পছন্দের স্কুল/মাদ্রাসা তার অপছন্দ। বাবা-মায়ের সিদ্ধান্তের সঠিকতার ব্যাপারে তার মোহমুক্তি ঘটে গেছে। সে হতাশ, বিষণ্ন, বিভ্রান্ত এবং নিজের ও গোটা দুনিয়ার ওপর রেগে আছে। তার এই প্রতিক্রিয়া, সমাজের সাথে তার বোঝাপড়ার। পরিবার অক্ষম ও সমাজ তার প্রতিকূলে। বাবা-মা তাকে বিদ্রোহী হিসেবে দেখছে।

বিপরীতে, অনুকূল পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে, কৈশোর হতে পারে পুরোটাই অন্যরকম। অনেক কিছু পড়ছে, জানছে, লিখছে এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছে। সে সুযোগ পাচ্ছে সৃজনশীলতা

চর্চার– ছবি আঁকা, গল্প-কবিতা লেখা, আবৃত্তি করা, ভিডিও করা, গান গাওয়া, তবলা বাজানো, অভিনয় করা, গিটার বাজানো, ইত্যাদি। সে পরার্থপরতার অভিজ্ঞতা পাচ্ছে বন্ধুদের কাছ থেকে। সে রক্তদান কর্মসূচিতে সক্রিয়, চাঁদা তুলে দরিদ্র বা বিপদগ্রস্ত মানুষের সেবা করছে। সাহিত্যের প্রতি তার ঝোঁক তৈরি হচ্ছে। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে কবিতার বই কিনছে। বাবা-মা, ভাই-বোনের কাছ থেকে যত্নশীলতা পাচ্ছে পারিবারিক আড্ডায়। বন্ধুদের সাথে বেড়াতে যাচ্ছে বনভোজন বা থিয়েটারে। এই যে দুই বিপরীত ভিন্ন প্রেক্ষিত, কিশোরের পৌরুষবোধ ও পুরুষালি আচরণে ভূমিকা রাখছে, নেতিবাচক বা ইতিবাচকভাবে। এই সামাজিকায়নে হরমোনের তেমন ভূমিকা নেই। আছে পারিবারিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক শিক্ষার, দেশ-কাল-অবস্থাভেদে যে বাস্তবতা ভিন্ন, সে বাস্তবতায় কৈশোরকালের বেড়ে ওঠা।

কিশোর মনস্তত্ত্ব খুব জটিল কোনো বিষয় না। কিশোরদের আচরণ ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে এবং এই আচরণের ব্যাখ্যা তার কাছ থেকে শোনার সময় ও ইচ্ছা থাকলে, কিশোরদের বোঝা সম্ভব। প্রয়োজন কেবল কথা শোনা, ডায়ালগ করা, জ্ঞানদান বা আদেশ-নির্দেশ করা নয়। এজন্য প্রথমেই, এদের সময় দিতে হবে, এরা যখন সময় চায়। যদি মনে হয় কিশোর ছেলেমেয়ে বড়োদের কথা শুনছে না, বদলাতে হবে কথা বলার কৌশল। বাবা-মার দায়িত্ব পালনে ভুল হতেই পারে, সেই ভুল থেকেও শিক্ষা নেওয়া যায়। এটা কোনো খারাপ ব্যাপার নয় যে, বাবা-মা কিশোর সন্তানের সাথে তর্ক করছেন, ঝগড়া করছেন। কিন্তু তাকে যে বিশ্বাস করছেন, ভালোবাসছেন, সেই অভিজ্ঞতাও দেওয়া দরকার। খুব প্রয়োজন না হলে নিয়মকানুন চাপিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

অনেক অভিভাবক জানেন না যে বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের ব্যাপারে শিক্ষা কীভাবে দেবেন। এজন্য অনেক বইপত্র রয়েছে। সহায়তা নিতে পারেন পরিচিত কোনো বন্ধু বা আত্মীয় বা বিজ্ঞান শিক্ষকেরও। আজকাল এই শিক্ষার জন্য অনেক অনেক সহায়ক উপকরণ রয়েছে। অনেক সামাজিক সংগঠনও রয়েছে, যাদের সাহায্য নিতে পারেন।

পরিবারের বা আত্মীয়স্বজনদের কিশোর-কিশোরীদের প্রতি নজর দিন। তারা কী ধরনের মূল্যবোধ শিক্ষা পাচ্ছে? তারা কাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে? তারা কি মানবিক মানুষ হয়ে উঠছে? তারা কি বিজ্ঞানচেতনায় সমৃদ্ধ সৃজনশীল ও নান্দনিকবোধ অর্জন করছে? তারা কি নারী-পুরুষ সমতা, প্রজননস্বাস্থ্য এবং জীবনদক্ষতা বিষয়ক শিক্ষা পাচ্ছে? এগুলো হলে সেটাই হবে পিতৃতন্ত্র বিলোপের জন্য জনগণের উদ্যোগ।

পিতৃতন্ত্র বিলোপের এবং নারী-পুরুষের সাম্যের সমাজ গড়ে ওঠার সংগ্রাম নানা উপায়ের, বহুমাত্রিক নানা ধরনের অনেক উদ্যোগের সমাহার; যেমন, 'ধর্ষণ' শব্দটিকেই বাদ দেওয়া দরকার। এটি আসলে 'বিকৃতকামী সহিংসতা'। এই সম্পর্কিত সংবাদ যেন এমনভাবে উপস্থাপিত হয়, যা নির্যাতকের চেহারা সামনে আনে। তার বিকৃত চরিত্র যেন সংবাদের শিরোনামেই প্রতিফলিত হয়। ধর্ষণ শব্দটি, যৌনবিকৃতিতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে আরো উৎসাহিত করে। কপিক্যাট এফেক্ট সম্পর্কে ভাবুন, দিল্লির চলন্ত বাসে সহিংসতা ঘটনার পরপরই বাংলাদেশে শুরু হয়ে গেল। এই কপিক্যাট এফেক্টের জন্য দৈনিক পত্রিকার ভূমিকা আছে। পিতৃতন্ত্রের ভাষারীতি বদলে দেওয়া দরকার। যারা লেখালেখি করছেন, পিতৃতান্ত্রিক ভাষারীতি বদলে দিয়ে, নারীর প্রতি সংবেদনশীল ভাষারীতির প্রচলন দরকার।

নির্যাতিতের পরিচয় নয়, বরং নির্যাতকের পরিচয়, নির্যাতকের বিশ্বাস, নির্যাতকের সাথে ক্ষমতার সম্পর্ক, নির্যাতকের মনোজগৎকেন্দ্রিক সংবাদ প্রচারের জন্য সামাজিক চাপ শুরু হোক। সংবাদ হোক পিতৃতান্ত্রিক স্বার্থের বিপক্ষে।

প্রতিটি এলাকায় বিকৃতকামীদের বিচারের জন্য স্থানীয় নারী, সাংস্কৃতিক কর্মী, তরুণদের সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। সমাজের নিজের নিরাপত্তার চেষ্টা নিজেদের হাতেই থাকা দরকার। স্থানীয় নারী সংগঠনসমূহ এই ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রতিটি কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ছাত্রদের উৎসাহিত করা দরকার, যাতে পিতৃতন্ত্রের সাথে নারী/শিশুর দ্বন্দ্ব নিয়ে এরা গবেষণা করে থিসিস পেপার লিখে। স্কুলে স্কুলে প্রজননস্বাস্থ্য নিয়ে ছেলেশিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হোক। নারীদের প্রতি বৈজ্ঞানিক ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য কিশোরদের জন্য স্কুলের বাইরে শিক্ষার ব্যবস্থা হোক। এদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হোক, যেখানে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রূপকল্প নির্মিত হবে– সেটা হবে এমন একটি বাংলাদেশের চিত্র, যেখানে নারী-পুরুষের অধিকার ও মর্যাদা থাকবে সমান, থাকবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও যত্নশীলতার সম্পর্ক।

বিকল্প জাতীয় নারী/শিশু সুরক্ষা নীতি প্রণয়নের জন্য সক্ষম লোকেরা এগিয়ে আসুন, যাঁরা বাংলাদেশের পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে বদলে দেওয়ার ইশতাহার রচনা করবেন। এই ইশতাহার নিয়ে প্রচার চলুক, এর প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হোক। একটি সফল সামাজিক আন্দোলন নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধের জন্য অপরিহার্য।

আজিজুর রহমান আসাদ প্রাক্তন ছাত্রনেতা। গবেষক ও উন্নয়ন পরামর্শক। asad.ar.khan@gmail.com